প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ চক্রান্ত এবং আরব বিশ্বের বিভক্তি

ফিরাস আল-খাতিব

আরব বিশ্ব জুড়ে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে একটি হৃদয়বিদারক ও মর্মন্তুদ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। একশো বছর পূর্বে প্রায় পুরো আরব অঞ্চলই ওসমানী খিলাফতের অংশ ছিলো। ওসমানী খিলাফত ছিলো ইস্তাম্বুল কেন্দ্রিক একটি বৃহৎ বহুজাতিক রাষ্ট্র। আজকে আরব বিশ্বের কোন রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এটা একটা জটিল জিগস পাজল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বেশ কিছু জটিল ঘটনার জের ধরে ওসমানী খিলাফতের পতন হয় এবং এই নতুন রাষ্ট্রসমূহের উত্থান ঘটে। মধ্যপ্রাচ্যের বুক চিড়ে বহু সীমানায় বিভক্ত এ রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই পরিণতির পিছনে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এ অঞ্চলের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত অন্য যেকোন শক্তির তুলনায় বৃটিশদের ভূমিকা ছিলো অধিক। বৃটিশরা তিনটি আলাদা আলাদা চুক্তি সম্পাদন করে, আর এই তিনটি চুক্তিতে উল্লেখিত প্রতিশ্রুতিগুলো ছিলো পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। এর ফলশ্রুতিতে এক ধরণের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা জন্ম নেয়, যা মুসলিম বিশ্বের বিশাল একটি অংশকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে।

১ম বিশ্বযুদ্ধের বিস্তারঃ ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়। জটিল প্রকৃতির মিত্রতা, সামরিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা, ঔপনিবেশিক আকাঙ্খা এবং সরকারগুলোর সর্বোচ্চ পর্যায়ের অব্যাবস্থাপনা [পৃথিবীকে] এ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে ১৯১৪-১৯১৮ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে মিত্রশক্তি ছিলো বৃটিশ , ফ্রেঞ্চ ও রাশিয়ানরা এবং অক্ষশক্তি গড়ে উঠেছিলো জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাংগেরির সমন্বয়ে। শুরুতে ওসমানী খিলাফত যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধরত অন্যান্য জাতির তুলনায় শক্তিমত্তার দিক থেকে ওসমানীরা পিছিয়ে ছিলো; তদুপরি বহুমুখী অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ হুমকির কারণে তারা ভেতর থেকেই বেশ ভঙ্গুর অবস্থায় ছিলো। ইতিহাসের এ পর্যায়ে ওসমানী খলিফা/সুলতান কেবল নামেমাত্র শাসক ছিলেন। ১৯০৮ সালে সর্বশেষ শক্তিশালী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের শাসনভার মূলত "তিন পাশার" নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণেই ছিলো। তারা ছিলো সেক্যুলার পাশ্চাত্যপন্থী গ্রুপ "ইয়ং টার্ক"দের দলভুক্ত। অর্থনৈতিকভভাবেও তাদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়; ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছে তাদের দেনা ছিলো প্রচুর, যা ওই মূহুর্তে তাদের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব ছিলো না। মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে ওসমানীরা ১৯১৪ সালের অক্টোবরে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান করে।

বৃটিশরা তাৎক্ষণিকভাবেই ওসমানী সাম্রাজ্যকে খন্ড-বিখন্ড করে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা শুরু করে। ১৮৮৮ সাল থেকে মিশর এবং ১৮৫৭ সাল থেকেই ভারতের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিলো। ওসমানী মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান ছিলো এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশের মাঝখানে। ফলে বৃটিশরা বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এ অঞ্চলের দখল নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

আরব বিদ্রোহঃ বৃটিশদের অন্যতম কৌশল ছিলো ওসমানী সুলতানাতের শাসনাধীন আরব জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল হেজাজে তারা একজন আগ্রহী সাহায্যকারীও পেয়ে যায়। মক্কার আমির শরীফ হোসাইন বিন আলী ওসমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদেশী ব্রিটিশদের সাথে তার চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণ কী ছিলো তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে তাঁর বিদ্রোহের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে- তিন পাশার তুর্কি জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যসমূহের প্রতি অসমর্থন, ওসমানী সরকারের সাথে ব্যক্তিগত

বিরোধ অথবা নিজস্ব রাজ্যলাভের আকাঙ্খা। কারণ যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, শরীফ হোসাইন ব্রিটিশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ওসমানী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন। বিনিময়ে ব্রিটিশরা অধিকতর সংগঠিত ওসমানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিদ্রোহীদেরকে অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্রিটিশরা আরো প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধের শেষে তাকে সমগ্র আরব উপদ্বীপব্যাপী আরব রাজ্য প্রদান করা হবে, যার মধ্যে সিরিয়া ও ইরাকও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

যে চিঠিগুলোর মাধ্যমে এই দুই পক্ষ বিদ্রোহ বিষয়ক আলাপ আলোচনা ও দরকষাকষি করছিলো, তা ইতিহাসে ম্যাকমেহন-হুসাইন পত্রবিনিময় নামে পরিচিত। কেননা শরীফ হোসাইন মূলত মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমেহনের সাথেই যোগাযোগ করছিলেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে শরীফ হোসাইন তাঁর সশস্ত্র বেদুইন বাহিনী নিয়ে হেজাজ থেকে ওসমানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেড়িয়ে পড়েন। কয়েক মাসের মধ্যেই আরব বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ সেনা ও নৌবাহিনীর সহায়তায় জেদ্দা ও মক্কাসহ হেজাজের বেশ কয়েকটি শহর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। বৃটিশরা সৈন্য, অস্ত্র, অর্থ, পরামর্শদাতা (বিখ্যাত লরেন্স অফ এরাবিয়াসহ) ও পতাকা প্রভৃতি দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। মিশরে অবস্থানরত ব্রিটিশরা আরবদের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য একটি পতাকাও তৈরি করে যা "আরব বিদ্রোহের পতাকা" নামে পরিচিত। এই পতাকা-ই পরবর্তীতে জর্দান, ফিলিস্তিন, সুদান, সিরিয়া ও কুয়েতসহ অন্যান্য আরব দেশের পতাকা তৈরির সময় মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালের দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, এ সময় আরব বিদ্রোহীরাও ওসমানীদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিতে সমর্থ হয়। জেরুজালেম ও বাগদাদ দখলের মাধ্যমে বৃটিশরা ফিলিস্তিন ও ইরাকের দিকে অগ্রসর হলে, আরবরা আম্মান ও আকাবা দখলের মাধ্যমে তাদের সহায়তা প্রদান করে। একথা উল্লেখ করা জরুরি যে, আরব বিদ্রোহ আরব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই সমর্থনপুষ্ট ছিলো না। এটি ছিলো কিছু নেতার নেতৃত্বে কয়েক হাজার গোত্রীয় লোকের একটি ক্ষুদ্র আন্দোলন, যাদের উদ্দেশ্য ছিলো স্বীয় ক্ষমতার প্রসার। আরব জনগণের একটি বিশাল অংশ এ সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকে এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী কিংবা ওসমানী সরকার কাউকেই সমর্থন প্রদান থেকে বিরত থাকে। শরীফ হোসাইনের নিজস্ব আরব রাজ্য তৈরির যে পরিকল্পনা তা সফল হতে পারতো, যদি না বৃটিশরা অন্য কিছু গ্রুপের সাথে ভিন্ন কিছু প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতো।

সাইকস-পিকট চুক্তিঃ আরব বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পূর্বে কিংবা শরীফ হোসাইন নিজস্ব আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বৃটেন ও ফ্রান্স অন্য নীলনকশা আঁকতে শুরু করে। ১৯১৫-১৬ সালের শীতে বৃটেনের মার্ক সাইকস এবং ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া জর্জ পিকট নামক দুইজন কূটনীতিক গোপনে মিলিত হন ওসমানী শাসন পরবর্তী আরব বিশ্বের ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্যে। সাইকস-পিকট চুক্তি নামে পরিচিত এ চুক্তির মাধ্যমে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছায়। এর মাধ্যমে আজকের দিনে ইরাক, কুয়েত ও জর্দান নামে পরিচিত এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে বৃটেন এবং আধুনিক সিরিয়া, লেবানন ও দক্ষিণ তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ফ্রান্স। জায়োনিস্ট আকাঙ্খার কথা বিবেচনায় রেখে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমঝোতা হয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণাধীন কিছু এলাকায় আরবদের স্বল্প মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দেওয়া হয়, যদিও এ ধরণের আরব রাজ্যগুলোর উপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ যেন হাতছাড়া না হয় তাও নিশ্চিত করা হয়। আর অন্যান্য এলাকায় বৃটেন ও ফ্রান্সের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তি গোপন থাকার কথা থাকলেও তা ১৯১৭ সালের দিকে জনসম্মুখে চলে আসে, যখন রাশিয়ার বলশেভিক সরকার তা প্রকাশ করে দেয়। সাইকস-পিকট চুক্তি শরীফ হোসাইনকে দেওয়া বৃটিশদের প্রতিশ্রুতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক ছিলো। ফলে এ নিয়ে আরব ও বৃটিশদের মধ্যে এক ধরণের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অবশ্য এটিই ব্রিটিশদের করা সর্বশেষ সাংঘর্ষিক চুক্তি ছিলো না।

বেলফোর ঘোষণাঃ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে কুশীলব হতে চাওয়া আরেকটি গ্রুপ ছিলো জায়োনিস্টরা। জায়োনিজম হলো একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতো। এ আন্দোলন শুরু হয় ১৯ শতকে যার উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপের বাইরে ইহুদিদের জন্য একটি আবাসভূমি খুঁজে বের করা। ইহুদিদের অধিকাংশই বাস করতো জার্মানি, পোল্যান্ড ও রাশিয়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জায়োনিস্টরা ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে করে তারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের সুযোগ দেয়।

বৃটিশ সরকারের অভ্যন্তরেও অনেকে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর। ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর তিনি জায়োনিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা ব্যারন রথচাইল্ডের কাছে একটি চিঠি পাঠান। ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে জায়োনিস্ট লক্ষ্য, এ চিঠিতে তার প্রতি বৃটিশ সরকারের আনুষ্ঠানিক সমর্থনের ঘোষণা দেওয়া হয় এভাবেঃ "বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি জাতীয় বসতি স্থাপনের ব্যাপারটি ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং এ লক্ষ্য অর্জনকে সহজতর করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ বিষয়টিও পরিষ্কার থাকে যে, ফিলিস্তিনে বসবাসরত অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘিত হয় অথবা অন্যান্য দেশে বসবাসরত ইহুদিদের অধিকার ও

রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এরকম কিছুই করা হবে না।"

তিনটি সাংঘর্ষিক চুক্তিঃ অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ১৯১৭ সালের মধ্যেই বৃটেন তিনটি ভিন্ন পক্ষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি চুক্তি সম্পাদন করেছে যেগুলোতে আরব বিশ্বের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে তিনটি ভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেখা যায়। একদিকে আরবরা জোর দিতে থাকে যেন শরীফ হোসাইনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত আরব রাজ্য তারা পায়। আবার ফ্রান্স ও বৃটেন ঠিক একই অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার নীল নকশা করতে থাকে। আবার অন্যদিকে জায়োনিস্টরাও বেলফোর প্রতিশ্রুত ফিলিস্তিন পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

১৯১৮ সালে মিত্রশক্তির বিজয় ও ওসমানী সুলতানাতের পতনের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়। যদিও ওসমানীরা ১৯২২ সাল পর্যন্ত এবং খিলাফত ১৯২৪ সাল পর্যন্ত নামেমাত্র টিকে ছিলো, এ সময় ওসমানীদের শাসনাধীন পুরোটা অঞ্চলই ইউরোপীয়দের দখলে চলে যায়। যুদ্ধ শেষ হয়; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যত তিনটি ভিন্ন পক্ষের বিরোধে আটকা পড়ে। কিন্তু কোন পক্ষ এ বিরোধে জয়লাভ করে?

প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষই তারা যা চেয়েছিলো তা পূর্ণাঙ্গভাবে পায় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস গঠিত হয়। এর অন্যতম কাজ ছিলো অধিকৃত ওসমানী অঞ্চলগুলোর ভাগ বাটোয়ারা করা। লীগ অফ নেশনস ম্যান্ডেট আকারে আরব বিশ্বকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে। প্রতিটি ম্যান্ডেটকে ব্রিটিশ অথবা ফ্রেঞ্চ শাসনের অধীন করা হয় ততদিনের জন্য, "যতোদিন পর্যন্ত না তারা স্বনির্ভর হতে পারছে"। মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক রাজনৈতিক মানচিত্রে যে সীমানাগুলো দেখা যায়, তা লীগ অফ নেশনস□রই নির্ধারণ করা। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীদের কোন মতামত ছাড়াই এই সীমানাগুলো টানা হয়। এমনকি নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক অথবা ধর্মীয় সীমানার কথাও এখানে বিবেচনায় রাখা হয় নি। এ সীমানা ছিলো পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী। এটি উল্লেখ করা জরুরি যে, এমনকি আজকেও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক সীমানাগুলো অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উপস্থিতি নির্দেশ করে না। বরঞ্চ ইরাকী, সিরীয়, জর্দানি কিংবা অন্যদের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিদের তৈরি করা, যাদের উদ্দেশ্য ছিলো আরবদের বহুধাবিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া।

ম্যান্ডেট ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের আকাঙ্খিত মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। শরীফ হোসাইনের ক্ষেত্রে তার ছেলেরা বৃটিশ "সুরক্ষার" অধীনে ম্যান্ডেটগুলোতে শাসনকাজ পরিচালনা করার সুযোগ পায়। প্রিন্স ফয়সালকে ইরাক ও সিরিয়া এবং প্রিন্স আব্দুল্লাহকে জর্দানের রাজা বানানো হয়, যদিও কার্যত এই অঞ্চলগুলোর প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিলো বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে। জায়োনিস্টরা বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছু শর্তসাপেক্ষে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। বৃটিশরা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরবদের ক্ষ্যাপাতে চায় নি; তাই তারা ফিলিস্তিনে অভিবাসনে আগ্রহী ইহুদিদের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে জায়োনিস্টরা ক্ষেপে যায় এবং ১৯২০ এর দশক থেকে শুরু করে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তারা অবৈধ পথে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমাতে থাকে। এতে আরবরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কেননা এ অভিবাসন তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভূমিতে এক ধরণের অনুপ্রবেশ হিসেবে প্রতিভাত হয়□ যে ভূমি ১১৮৭ সালে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কর্তৃক মুক্ত হওয়ার পর থেকে তাদের নিজেদের ভূমি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছিলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এ অঞ্চলে বৃটেন তৈরি করেছিলো তা আজও বিদ্যমান। পরস্পর সাংঘর্ষিক চুক্তিসমূহ এবং এগুলোর ফলশ্রুতিতে তৈরি হওয়া রাষ্ট্রসমূহ মুসলমানদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মুসলমানদের মধ্যকার অনৈক্য ও বিভেদ পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। একদিকে জায়োনিজমের উত্থান আর অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যকার অনৈক্য□ এ দুইয়ের ফলে সামগ্রিকভাবে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার ও অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে উঠে। মুসলিম বিশ্বে বৃটিশদের আরোপিত এই বিভাজন ও বিভেদ একশো বছর আগে সৃষ্টি করা হলেও তা আজো শক্তিশালীভাবে উপস্থিত।

তথ্যসূত্রঃ

Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: H. Holt, 2001.

Hourani, Albert Habib. A History Of The Arab Peoples. New York: Mjf Books, 1997. Print.

Ochsenwald, William, and Sydney Fisher. The Middle East: A History. 6th. New York: McGraw-Hill, 2003. Print.

সূত্রঃ Lost Islamic History

ফিরাস আল-খাতিব

ফিরাস আল-খাতিব ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে ব্যাচেলর্স এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিডল ইস্টার্ণ স্টাডিজে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি Near Eastern Languages and Civilizations বিভাগে ওসমানীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস এবং ইসলামী আইনতত্ত্বের উপর পিএইচডি করছেন। তাঁর রচিত বই Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilization from the Past ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়।